Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৫তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪২৯ / 24.02.2023

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

জন্মদিনে বাণী	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভারতাত্মা শ্রীচৈতন্য	ডাঃ রুহিদাস সাহা
সেক্সপীয়ারের সনেট	অনুঃ-শ্রী সরোজকুমার দত্ত
বেঁচে থাকার কবিতা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

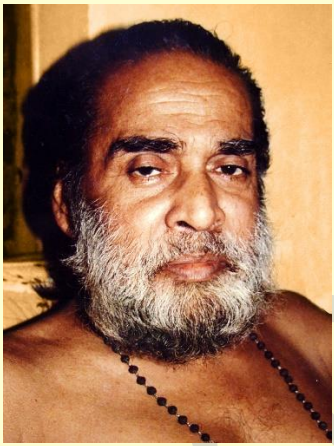

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

জন্মদিনে বাণী **শ্রীপ্রীতিকুমার**

(২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ সাল)

আজকের এই শুভ দিনে আমার জীবনে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম ও ধর্মজীবনের পূর্ণতা সাধনে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহায়তাও কামনা করি।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং তাঁর লীলায় সহায়তা করবার জন্য আমরা আগেও যেমন মিলিত হয়েছিলাম, এজন্মেও পুনরায় সম্মিলিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন – কলমির দলের এক জায়গায় টান দিলে চারদিক হ'তে তার লতাপাতার দল জড়ো হয়।

পূর্বে আমাদের সংযোগ ছিল, তাই এজন্মেও আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। বিগত জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর যেটুকু কর্ম অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্মে সেই দিব্য কর্মে পূর্ণতা আনবার জন্যই আবার আমরা মিলিত হয়েছি। এই জন্মেই আমাদের সেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

DO NOT COPY

সকলেই যে ব্যক্তিগত ভাবে সাধন-ভজন করতে পারছেন বা পারবেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা, আলাপন, আদান-প্রদান – এগুলির মাধ্যমে যে শাশ্বত স্পন্দন ও স্ফূরণ ঘটছে, তাতেই আমরা সেই পরমের নিকটবর্তী হচ্ছি অতি সহজে।

আমাদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-ব্যথার যতই সঙ্ঘাত আসুক না কেন, তা আমাদের মনকে সাময়িক ভাবে স্পর্শ করলেও আত্মা প্রাণ ও হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে না। এঁরা পূর্ণভাবেই সর্বদা যুক্ত আছেন তাঁর সাথে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত – যে ভাবেই হোক, তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলেছেন।

আমরা তাঁরই, তিনি আমাদেরই।

জয়তু পার্থসারথি!

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

প্রতিমাসে কলম ধরতে গেলে কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যায়। এতদিনের ঘটনাবলী একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কোনটি ছেড়ে কোনটি লিখব ভেবে ঠিক করতে পারিনা। তাঁর উপর সম্পাদক হচ্ছেন আমার পুত্তর। পছন্দ না হলে তিনি কাটাকাটি করে দেবেন। আমার মনের ভাবগুলি মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যায়।

একটি মানুষ শৈশবে পিতৃহারা হয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে ছিলেন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার জন্য, মা ভাই বোনদের প্রতি কর্তব্য করবার জন্য। শেষ জীবনে সেই মানুষটি সংসার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে গিয়েও পারেন

DO NOT COPY

নি। নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে সুখের মুখ দেখতে দেয়নি। তিনি নীলকন্ঠ হয়ে গেলেন। স্নেহ নিম্নগামী। এই স্নেহ ভালবাসার জন্য তিনি কিই না করেছেন! অথচ তাঁকে এখন সবাই ঠাকুর করে দিয়েছেন। তাঁর ঠাঁই এখন মনের আসনে নয়, ঠাকুরের আসনে। আমার খুব হাসি পায়। আমাদের বলতেন - "জীবনে যে কত কষ্ট তা' নিজে জন্মে বুঝছি।" -- আমার আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কষ্ট তাঁকে আমি অনেক দিয়েছি -- আবার তাঁরই নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছি। আমার ছেলের (*প্রাক্তন বিয়ের) ঘটনাটা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। আমরা যতই সংস্কারমুক্ত আধুনিক হই না কেন সেই Intercast elder bride-কে তিনি খুব সহজে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বারবার, "আমার সন্তানের কাছ থেকে কষ্ট না পেলে আমার সাধনাই মিথ্যে--।" কোনও দিন তাঁর স্নেহের অভাব দেখিনি। কি মিষ্টি করে কথা বলতেন, সবচেয়ে বড় মিষ্টিটি বাড়ির সেই নতুন সদস্যের প্লেটে তুলে দিতেন সবচেয়ে আগে। হাত খরচ দিতেন আলাদা করে। Bank Account করে দিলেন সবার মতো। কোথাও ত্রুটি রাখেন নি। যার জন্য এতো করলেন, সে কয়েকটা বছর যথেচ্ছাচার করে গেলো। যা ইচ্ছে তাই বলে গেলো। আমার এই শিক্ষা হল - আজকাল এটাই নিয়ম, আজকাল বড়রা যা বলেন সব খারাপ, ছোটরা নতুনরা যা বলেন সেটাই ঠিক। মানুষের Security বড় কমে গেছে।

আমার কখনও মনে পড়ে না আমার শাশুড়ির সাথে আমার কখনও বাগ্ বিতণ্ডা হয়েছে। শাশুড়ি বৌয়ের মুখোমুখি ঝগড়া আমার জীবনে ঘটেনি। আমার প্রয়োজন ছিল তাই আমি চাকরী করেছি। এই কথার প্রসঙ্গে আমার দেবর বা ননদ বলতে পারেন, "মায়ের জন্য আমাকে তারা কিছুই করতে দেখে নি বা কর্তব্য করিনি।" সে কথা মা কিন্তু কখনও বলেন নি। শেষ যেদিন স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কাছে বসেছিলাম, আমার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "তোমার মত ত্যাগ ও নিষ্ঠা যদি সবার থাকতো!" সেই কথাটা সেদিন একান্ত আশীর্বাদ বলেই মনে করেছিলাম। স্মৃতিচারণ করতে গেলে সেকথাগুলি একদিন আসবেই। এখনও সময় হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আজ একটা কথা বলি। শ্রীশ্রীতিকুমার মেদিনীপুরে পশং গ্রামে একটি বাড়ি করেছিলেন তাঁর বিয়ের আগে। সেই বাড়িতে আমার শাশুড়ি থাকতেন। আমাকে পশং গ্রামের স্কুলে চাকরী দেবার অনেক ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীশ্রীতিকুমার এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন – "চাকরী করলে অন্য কোথাও, এই গ্রামে নয়। আমার মা রান্না করে দেবেন, আর আমার বৌ খেয়ে চাকরী করতে যাবে? তা হয় না।" অগত্যা আমার অন্যত্র চাকরী করবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমার ছোট দেওরের বিয়ে দিলে তাঁর স্ত্রী মায়ের কাছে থাকতে পারবে এই মনে করে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা হয়। চন্দ্র পিসেমশাই ('ফরিদপুরের গান্ধী' নামে খ্যাত শ্রী চন্দ্রনাথ বসু, যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং একমাত্র তিনিই আমাকে 'বউমা' বলতেন,) সন্টুর বিয়ের সম্বন্ধ করেন। সে কাহিনী পরে বলা যাবে। ১৯৬২/ ৬৩ সালে আমাদের বরানগরের বাড়ী কেনা হয়। আমরা ঐ বাড়িতে থাকাকালীন সন্টুর বিয়ে হয়। কিন্তু বউভাতের ঠিক পরই সে ব্যক্ত করে যে তাঁর স্ত্রীকে পশং গ্রামে রাখা সম্ভব নয়। তারা কল্যাণীতে থাকা শুরু করে। মন্টুদার অসুবিধের জন্য মা'কে নিয়ে টালায় বাসা করা হয়।

আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে চাকরী নিয়েছি। আমাদের বারাসতে বাড়ি হয়েছে। আমরা সপ্তাহে নিয়মিত দু' একদিন সেখানে থাকা শুরু করেছি। মোটামুটি শান্তিতে চলবার কথা।

এই সময়ে চন্দ্র পিসেমশাইয়ের পরামর্শে মন্টুদা গোরাবাজারে বাড়ি তৈরি করেন। মা, সন্টু, বেনুরা ওখানে থাকা শুরু করেন। তখন রণ (ভাগ্নে) কলকাতায় চাকরী করছে। তুলসী (ভাগ্নী) কলকাতায় তাঁর মা-বাবার সাথে থাকা শুরু করেছে। সুতরাং পশংয়ের বাড়িটার আর প্রয়োজন ছিল না সন্টুদের কাছে। শ্রীশ্রীতিকুমারের ঐ বাড়িটা বিক্রী করবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কারও মতামতে বাধা দেবার স্বভাব তাঁর একেবারেই ছিল না। তিনি নীরব রইলেন। বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল।

তখন মা ও মন্টুদা মাঝে মাঝে বরানগরে শ্রী প্রীতিকুমারকে দেখতে আসতেন। এমনি একটি রবিবার দুপুরে মা ও মন্টুদা বরানগরে এসেছিলেন। আমার তখন N.C.C., Mountaineering club, ইত্যাদি নানারকম outdoor work থাকতো। আমি সে সময়ে বাড়ী ছিলাম না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপ্রীতিকুমার বড় বড় চোখ করে বললেন, "একটা সর্বনাশ হয়েছে।" আমি মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। বলে উঠলেন, "পশংয়ের বাড়ী বিক্রী করে মা আজ টাকা দিয়ে গেছেন।" আমি বললাম, "কেন?" বললেন, "মা বললেন, বাড়িটাতো আমি করেছি, তাই ঐ বাড়ী বিক্রীর টাকা আমাকেই দিয়ে গেলেন।" আমি বললাম, "ও বাড়ীতো মন্টুদা, সন্টুর নামে করে দেওয়া হয়েছে। ও টাকাতে তো তাদের অধিকার। নিজে নিয়েছে কেন?" বললেন, "মা'কে মুখের উপর ফেরাতে পারলাম না। তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

কোন বিপদে পড়লে আমার কথা মনে হতো। তখন কি বাধ্যতা! "বাবু, তোমার মা'কে চা করে দাও; বাবু, তোমার মা'কে দুটো কবিরাজী কাটলেট এনে দাও ..." ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ তখন তো মুস্কিল আসান এই শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ। ভোরবেলা কাজকর্ম চুলোয় গেলো। সেই টাকার বাণ্ডিল নিয়ে সটান মায়ের কাছে, মা'কে বললাম, "এ' টাকা তো মন্টুদা সন্টুর। আপনি বড় ছেলেকে দিয়ে এসেছেন কেন?"মা বললেন, "ওই তো করেছিল। তাই ওকেই দিয়েছিলাম।" আমি বললাম, "ওসব তো অনেকদিন আগের কথা। এ টাকা আমি খরচ করতে পারব না। আপনাকে দিয়ে গেলাম।" মা বললেন, "তাহলে ও টাকাতে বারান্দা ইত্যাদি Plaster করা যাবে।" তাই হয়েছিলো।

এ' ভাবেই কেটেছে আমার দিন। কাছে থেকে মায়ের সেবা আমার করা করা আমার হয়নি সেকথা ঠিক, তবে মা'ও দু' একবার ছাড়া আমার সেবা নিতে আসেন নি। তাঁর সময়ও হয়নি, সুযোগও হয়নি। তবে শুধু ভাত রেঁধে তো আর সেবা হয় না। শ্রীপ্রীতিকুমারের ইচ্ছানুযায়ী যে ভাবে সেবা করবার দরকার তা করেছি। আজ আমাকে কে কি বললো, ভাবলো, তা নিয়ে মাথা

ঘামাই না। একটা জিনিষ সারের সার বুঝে গেছি যে নিজের পায়ে জোর থাকলে আর অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে হয় না।

মা আমাকে বহুবার বলেছেন প্রথম সন্তানের মত আপন কেউ হয় না। শ্রীপ্রীতিকুমার বার বার আমাদের বলেছেন, "আমার মা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।" মা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। বাড়িতে ঢুকবার কত আগে চিৎকার করতেন "মা" "মা" বলে। মা একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে আসতেন। আমাকেও অসম্ভব স্নেহ করেন। কিন্তু এখন আর ঁবিজয়া দশমী ছাড়া আমি যাই না। আমার মনে হয় আমাকে দেখলেই তো তাঁর সেই সন্তানকে মনে পড়ে যাবে। তাছাড়া গত তিন বছর আমার পুত্তরের আইন আদালতের সমস্যার কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় ব্যাহত বলা যেতে পারে। একটি জিনিষ আমাদের কাছে এখন normal -- Case আর Court।

আমাদের নাতি নাতনী ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের চোখের মণি। আমার খুব অবাক লাগে যখন ভাবি নাতনীর হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা লেগেছিল বলে শ্রীপ্রীতিকুমার সারা জীবনের মত সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার খুব অবাক লেগেছিল দেখে যখন নাতি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলো, শ্রীপ্রীতিকুমার ক্রিশের মুখ দেখে একটি সোনা বাঁধানো ১০৮টি রুদ্রাক্ষের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেন। আমি এইসব ঘটনার কোনও অর্থ খুঁজে পাইনি।

১৯৮৬-র ২৪শে নভেম্বর থেকে অনেকে অনেক ভাবে শ্রীপ্রীতিকুমারকে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি বোকার মত তাদের যত্ন করতে শুরু করেছিলাম। মনে হচ্ছিল তারা কি অজানা খবর এনে দেবে। এখন আর আমি অন্যের উপর ভরসা করিনা। আমার প্রয়োজনে তিনি আমাকেই স্বপ্ন দেখাবেন এ বিশ্বাস এখন আমার আছে।

মাঝে মাঝে কিশোরকে বলতেন, "তোমার মামীমাকে ভগবান শক্তি দেয়নি কেন জানো? সর্বনাশ হয়ে যাবে। ...." আমি কিন্তু তাঁর সামনে বলতাম,

"নিজের (ভাববাচ্যে) মত শক্তি যদি আমি এক দিনের জন্যও পেতাম!" এখনও মনে হয় একটা অঘটন কেন ঘটে যায় না? কেন চোখ খুলেই দেখতে পাই না আমার বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেছে? কি জানি ... বুঝতে পারিনা।

স্মৃতিচারণে সব কথা সবার মনের মত নাও হতে পারে। মানুষের জীবনটা তো মাখনের ডেলা নয়! সেখানে দুঃখ আছে, শোক আছে; সত্য আছে, ক্ষমা আছে, শান্তি আছে। যে ব্যথা, যে যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, তা আমার সাধারণ জন্মের তুলনায় অনেক বেশি। হয়ত একজন মহাপুরুষের ঘরণী হবার জন্য আমাকে pay করতে হচ্ছে। তবু তাঁর মধ্যে ভালো কি নেই? সবটাই তো ভালো করে নেওয়া যায়। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে দিয়েছেন অমন একটি সত্যনিষ্ঠ জেদী কষ্টসহিষ্ণু পুত্তর যাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি সেই ১৯৫০ সালের একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের পায়ে এগিয়ে আসাই দেখতে পাই। প্রশ্ন জাগে, বাপের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব কি সন্তানের জীবনটাকেও বদলে দিতে যাচ্ছে? তবু গত ঁকালীপূজার দিন ঐ শ্যামবাজারের ঘরে সন্তানকে আশীর্বাদ করে ফেলেছিলাম, "বাপী, একজন সাধকের স্ত্রী হয়ে আমার জীবনে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। আজ আমি মনে প্রাণে একজন বড় সাধকের মা হতে চাই ....."।

– – – – – – — – – –

(** রচনাকাল - মার্চ, ১৯৯০)

"মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ - সে জাত কখনও বড় হতে পারেনি। কস্মিনকালে পারবেও না।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

DO NOT COPY

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে যান সেদিন স্বেচ্ছায় যাননি, গিয়েছিলেন বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের আগ্রহে। ঠাকুরের কথা বন্ধুদের কাছে যতই শুনুন না কেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে সেখানে গেলেই তাঁর অভীষ্ট লাভ হবে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে তিনি তাঁকে প্রণামও করেন নি। কিন্তু যখন ফেরেন তখন তিনি অন্য মানুষ। ঠাকুরকে শুধু প্রণাম তাই নয়, ঠাকুরকে মন প্রাণ সমর্পণ করলেন।

ঠাকুর অবতার কিনা – এই প্রশ্ন উঠেছিল সুরেন্দ্রর মনে। তিনি স্থির করলেন ঠাকুরঘরে বসে তিনি যখন ধ্যান করেন তখন যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয় তাহলেই তিনি ধরে নেবেন ঠাকুর অবতার।

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান।
ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান।।
এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর।
সুরেন্দ্রের প্রভুপদে পড়িল নির্ভর।। (পুঁথি)

ঠাকুরকে মনপ্রাণ দেওয়ার পর সুরেন্দ্র সারাদিন অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সত্ত্বেও ঠাকুরের স্মরণ মনন নিয়ে থাকতেন। কোন কোন দিন কাজ অসমাপ্ত রেখেই দক্ষিণেশ্বরে ছুটতেন। একদিন গিয়ে দেখেন অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই বাড়িতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ করার এই সুযোগ সুরেন্দ্র ছাড়লেন না। ঠাকুরকে নিয়ে তিনি বাড়িতে চলে আসেন এরপর যে ঠাকুর কতবার সুরেন্দ্র ভবনে এবং ভক্ত সঙ্গে আনন্দ উৎসব করেছেন তার সংখ্যা নেই।

অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝেছিলেন সুরেন্দ্রের অর্থের অহংকার আছে। ভক্তের ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে তাকে নির্মল নিষ্কলুষ করাই ছিল ঠাকুরের উদ্দেশ্য। একদিন

DO NOT COPY

ঠাকুর সুরেন্দ্র ভবনে ঈশ্বর প্রসঙ্গে মেতে আছেন এমন সময় সুরেন্দ্র মালা নিয়ে ঠাকুরকে পরাতে গেলে ঠাকুর সেই মালা গলায় না পরে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় সুরেন্দ্র প্রথমে খুবই ক্ষুব্ধ হন, পরে অবশ্য তিনি নিজের দোষ বুঝতে পারেন। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি বলতে থাকেন – "ভগবান পয়সার কেউ নয়, অহংকারের কেউ নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন নেবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।" তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। অনুতাপে মনের ময়লা কেটে যায়, চিত্তশুদ্ধি হয়। এরপর ঠাকুর সুরেন্দ্রকে কৃপা করতে দ্বিধা করলেন না। কীর্তন ও নৃত্য শুরু হলে ঠাকুর ফেলে দেওয়া মালাটি তুলে নিয়ে নানা ছন্দে হাতে দোলাতে দোলাতে নৃত্য করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত গলায়ও ধারণ করলেন। বিদায়ের আগে যেচে কিছু খেয়েও গেলেন। সুরেন্দ্রের মনে আর কোন দুঃখ রইল না।

কার কি প্রয়োজন ঠাকুর বুঝতেন। সুরেন্দ্রকে তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে।" সুরেন্দ্র ঠাকুরের সে উপদেশ পালন করতেন, এমন কি তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপনের কথাও ভেবেছিলেন যদিও স্ত্রীর বিরোধিতায় সে সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ঠাকুরের সঙ্গগুণে সুরেন্দ্রের স্বভাবের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। সুরেন্দ্র মদ্যপান করতেন। ঠাকুর তা জানতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বললেন, "দেখ, যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে; আর যেন মাথা না টলে পা না টলে। তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার পান করতে আর ভালো লাগবে না – তিনি কারণানন্দদায়িণী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।" সেই থেকে সুরেন্দ্র ঐ নিয়মেই চলতেন। প্রতি সন্ধ্যায় মা কালীকে সামান্য সুরা নিবেদন করে সেই প্রসাদ পান করতেন। তাতে তাঁর নেশা হত না, ভজনানন্দের উদয় হতো। মুখে মা, মা উচ্চারণ করতেন, চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইত।

এইভাবে সুরেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল জীবন অনেকটা সংযত হয়েছিল, বিষয় কামনা হ্রাস পেয়েছিল। তথাপি তিনি মনে করতেন তিনি পাপী, তাঁর অসৎ সংস্কার কমেনি।

একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে একথা বলেছিলেন। সুরেন্দ্রের আত্মবিশ্লেষণ ও অকৃত্রিম আত্মধিক্কার দেখে ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "আনন্দময়ী করুন, তোমরা সকলে আনন্দে থাক।"

ঠাকুরের এই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। অচিরেই সুরেন্দ্রের হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শারদীয়া পূজার সময় ঠাকুর চিকিৎসার জন্যে শ্যামপুকুরে অবস্থান করছিলেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের আজ্ঞা ও আশীর্বাদ নিয়ে নিজের বাড়ীতে মহাপূজার আয়োজন করেন। অসুস্থতা বশত ঠাকুর উপস্থিত হতে পারেন নি, তাই সুরেন্দ্রের মনে আনন্দ নেই। নবমী পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। ভাবছিলেন সুস্থ থাকলে তো ঠাকুর নিশ্চয়ই তাঁর গৃহে শুভাগমন করতেন। এমন সময় তিনি সহসা দেখলেন প্রতিমার মধ্যেও যেন ঠাকুরই অবস্থান করছেন।

সুরেন্দ্র সমানভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্ত্তি মনে ধিয়াইয়া।।
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান।। (পুঁথি)

এদিকে শ্যামপুকুর বাড়িতে ভক্ত সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ করতে করতে ঠাকুর হঠাৎ সমাধিমগ্ন হন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি উপস্থিত ভক্তদের বলেনঃ এখান থেকে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম, তাঁর ভক্তিতে প্রতিমায় আবেশ হয়েছে। দালানের ভিতরে দেবীর সন্মুখে দীপমালা জ্বেলে দেওয়া হয়েছে; আর সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা, মা' বলে কাঁদছে। বিজয়া দশমীর দিনে সুরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে গেলে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেনঃ 'কাল ৭টা সাড়ে ৭ টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান; ঠাকুর প্রতিমা রয়েছে; এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু' জায়গার মাঝখানে বইছে।'

ঠাকুরের কৃপায় সুরেন্দ্রের ভক্তি বিশ্বাস ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরই

উদ্যোগে ১৮৮১ সালে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের সূচনা হয়। এ জন্য তিনি ব্যয়ও করতেন মুক্ত হস্তে। শুধু উৎসব নয় ঠাকুরের সেবার প্রয়োজনেও তিনি সানন্দে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। কাশীপুর উদ্যানে মাসে প্রায় দু'শ টাকা ব্যয় হত, এর সিংহ ভাগ তিনিই ব্যয় করতেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও সুরেন্দ্র ঠাকুরের দর্শন ও নির্দেশ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সুরেন্দ্র ঠাকুর ঘরে বসে আছেন, এমন সময় দেখলেন ঠাকুর সামনে এসে বলছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে – তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" এরপর তিনি পাগলের মতো নরেন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে বললেন, "ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কাম কাঞ্চনত্যাগী ভক্তরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে যেখানে জুড়তে পারি। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম এখনও তাই দেব।" এরপরই রামকৃষ্ণ মঠের সূচনা হয়। এই প্রসঙ্গে কথামৃতকার বলেছেনঃ "ধন্য সুরেন্দ্র! এই মঠ তোমারই হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী কাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন।"

রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তই মনে হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গৃহী শিষ্য। কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকা থেকে ঠাকুরের সন্ধান পেয়ে মাসতুতো ভাই ও বন্ধু মনোমোহন মিত্রকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রথম দিনে ঠাকুরের ব্যবহারে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়েছিলেন যে সেদিন থেকেই নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করতে থাকেন।

এরপর প্রতি রবিবার রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন। ঠাকুরের কথামৃত পান করে তিনি অপার আনন্দ পেতেন এবং তারই স্মরণ মননে সপ্তাহ

কেটে যেত।

ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করেও রামচন্দ্রের মনে অলৌকিকত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা ছিল। একদিন স্বপ্ন দেখলেন তিনি একটি পুকুরে স্নান করে পবিত্র হয়েছেন এবং ঠাকুর সেখানে এসে মন্ত্র দিয়ে প্রতিদিন স্নান করে ভিজে কাপড়ে একশ বার জপ করতে বলছেন। এই স্বপ্ন দর্শনে রামচন্দ্র খুবই আনন্দ অনুভব করেন এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সব কিছু নিবেদন করেন। ঠাকুর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন, "স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাই।"

রামচন্দ্রের জীবনে নানা অশান্তি ছিল। হয়তো বা তিনি ভেবেছিলেন ঠাকুরের কৃপায় তাঁর সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পরও অশান্তির অবসান হয়নি দেখে একদিন 'কিছুই হল না' বলে ঠাকুরের কাছে আক্ষেপ করছিলেন। ভক্তের ভাবটি হবে নিষ্কাম প্রেমভক্তির। রামচন্দ্রের মনে সেই ভাবটি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক উপেক্ষা দেখিয়ে ঠাকুর বললেন, "কি করব বাপু, সবই হরির ইচ্ছা।" তাতেও রামচন্দ্র ক্ষান্ত হন না দেখে বললেন, 'আমি কারো খাইও না, নিইও না – তোমাদের এখানে আসতে ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না।" এই কঠোর উপেক্ষায় ব্যথিত হলেও রামচন্দ্র সঠিক পথের সন্ধান করতে শিখলেন।তিনি জানতেন নামী অপেক্ষা নামের মহিমা বেশী। তাই তিনি রাত্রে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসে নাম জপ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ঠাকুরের মন পাওয়া। এতে ফলও পাওয়া গেল গভীর রাতে ঠাকুর রামচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর মনের খেদ দূর করলেন।

রামচন্দ্র ধনী হলেও ব্যয়কুন্ঠ ছিলেন। ঠাকুর তা জানতেন, তাই রামচন্দ্র তাঁকে নিয়ে নিজের বাড়িতে উৎসব করতে চাইলেও ঠাকুর রাজী হননি। মনে হয় তাতে রামচন্দ্রের মনে অভিমান হয়েছিল। তখন ঠাকুর নিজেই রামচন্দ্রের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে বাড়িতে উৎসব করলেও প্রথম প্রত্যাখানের দু:খ সম্পূর্ণ ভুলতে পারেন নি। অন্তর্যামী ঠাকুর অল্প দিনের মধ্যে ফুলদোল উপলক্ষ্যে আবার রামচন্দ্রের বাড়িতে শুভাগমন করেন।

এবারে ভক্ত সমাগমে, সংকীর্তন ও ধর্মপ্রসঙ্গে বাড়ি এতই মুখরিত হয়ে উঠেছিল যে রামচন্দ্রের মনের খেদ দূর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে তাঁর কার্পণ্য দূর হয়। এরপর ঠাকুরের উৎসব বা ভক্ত সেবায় তিনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন। প্রতি বৎসর ফুলদোল উপলক্ষ্যে ঠাকুরকে নিয়ে মহোৎসব হত। তাছাড়া অন্য উপলক্ষেও ঠাকুর রামচন্দ্র ভবনে পদার্পণ করতেন।

রামচন্দ্রের মনে ইচ্ছা হয় ঠাকুর নিজের মুখে তাঁর স্বরূপ বলবেন। অন্তর্যামী ঠাকুর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসে একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখছিলেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কি দেখছ? রামচন্দ্র উত্তর করলেন 'আপনাকে'। সে কথা শুনে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তোমার কি মনে হয়? রামচন্দ্র উত্তর করলেন, "চৈতন্যদেব বলে মনে হয়। একথা শুনে ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বামনীও (ভৈরব ব্রাহ্মণী) ঐ কথা বলত বটে।" রামচন্দ্রের মন থেকে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। এখন তাঁর স্থির বিশ্বাস হল, ঠাকুরও চৈতন্যদেব এক ও অভিন্ন। একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরে তিনি ভক্তি বিহ্বল কন্ঠে বলেছিলেন, "গিরিশদাদা বুঝেছ কি? এবারে একে তিন – গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব – একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান।"

ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্রের মনে গভীর ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয় এবং তিনি রামকৃষ্ণ ভাবধারার অন্যতম ধারক ও বাহকে পরিণত হন। ঠাকুর একদিন ভক্তদের বলেছিলেন, "দেখ, আমি মাকে বলেছিলাম যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয়, কেদার এদের একটু শক্তি দে – এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব। ঠাকুরের এই প্রার্থনা সফল হয়েছিল। মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রচারের গুণে কত শত ব্যক্তি যে রামকৃষ্ণ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠাকুরের অনুমোদনক্রমে নির্মিত, ঠাকুরের পাদস্পর্শে ধন্য কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান রামচন্দ্রের অমর কীর্তি। এই সাধনক্ষেত্র কত ধর্মপিপাসুকে তৃপ্তি দান করেছে! এটি আজও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহাতীর্থ।

DO NOT COPY

মনোমোহন মিত্র

মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একত্রে দক্ষিণেশ্বরে এসে মনোমোহন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের গুণে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন।

ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর মনোমোহন প্রতি রবিবার নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। কয়েকবার কেশব চন্দ্রের সঙ্গেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। কেশবের মতো অত বড়ো ধর্মনেতাও ঠাকুরকে গভীরভাবে ভক্তি করেন এবং নীরবে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর কথামৃত পান করেন দেখে ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি আরও দৃঢ় হয়েছিল। তবে তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও দক্ষিণেশ্বর – এই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দু' নৌকা বজায় রাখতে পারেন নি। ধীরে ধীরে ঠাকুরই তাঁর আশ্রয় হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে করতে মনোমোহনের বিশ্বাস হয় ঠাকুর মানুষ নন, – অবতার। তারপর তাঁর মনে ঠাকুরের সেবা করার বাসনা জাগে। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে ঠাকুর পা ছড়িয়ে বসে আছেন। মনোমোহনকে দেখেই ঠাকুর পা গুটিয়ে নেন। তাতে মনোমোহনের মনে অভিমান হয়। তিনি ঠাকুরকে বললেন, "বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন? শীগগির বার করুন, নতুবা কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে গিয়ে কোন্নগরে রাখব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।" ঠাকুর আর আপত্তি করতে পারলেন না, মনোমোহন ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবার দুর্লভ অধিকার লাভ করলেন।

ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য মনোমোহন তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ঠাকুরের পদপ্রান্তে টেনে আনেন। তাঁর ভগ্নীপতি রাখাল মহারাজ ছিলেন ঠাকুরের মানস পুত্র।

মনোমোহন প্রায়ই ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আনন্দোৎসব করতেন। একবার কেশবচন্দ্রও এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মনোমোহনের মেসোমশাই রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতেও একবার মহোৎসব হয়।

সেখানেও কেশব উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে নিজ গৃহে এবং আত্মীয় গৃহে ঠাকুরের শুভাগমনের ফলে মনোমোহন ও তাঁর পরিবার পরিজনের মনে একটি মধুর ভক্তিভাবের বিকাশ ঘটেছিল।

মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরের উপরেও অভিমান্ করে বসতেন। একবার ঠাকুর তাঁর সামনে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভক্তির প্রশংসা করলে তিনি অভিমান করে কয়েক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে আসেন নি। কোন্নগর থেকে তাঁকে আনবার জন্যে ঠাকুর রাখালকে পাঠিয়েও ফল হল না। তিনি রাখালকে ফিরতে না দিয়ে জনৈক ভক্ত মারফৎ বলে পাঠালেন, "আগে ভক্তি হোক তবে যাব।" শেষ পর্যন্ত ঠাকুরকে কোন্নগরে এসে তাঁর মান ভাঙ্গাতে হল। একদিন সকালে গঙ্গা স্নানের সময় একখানা নৌকায় বলরামবাবুকে দেখে মনোমোহন বললেন, "আজ প্রাতেই ভক্ত দর্শন হল – আজ আমার মহা সৌভাগ্য দেখছি।" বলরাম জানালেন, শুধু ভক্ত নয়, গুরু খোদ এসেছেন। ঠাকুর স্বয়ং এসেছেন শুনে মনোমোহন চমকে উঠলেন। নিরঞ্জনও বললেন, "আপনাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠাকুর স্বয়ং এখানে এসেছেন।" ঠাকুরের নৌকা কাছে আসতেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর দুচোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বইতে লাগল। নিজের অভিমান বশতঃ ঠাকুরকে তিনি কত কষ্ট দিয়েছেন ভেবে মনোমোহনও বিবশ হয়ে পড়লেন। নিরঞ্জন এসে তাঁকে না ধরলে তিনি জলে পড়ে যেতেন। এরপর তিনি ঠাকুরের পায়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে আকুল হলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফেরার সময় মনোমোহন তাঁর অনুগমন করেছিলেন। মনোমোহনের স্বভাবের দোষত্রুটি ঠাকুর শুধরে দিতেন। একবার কোন ব্যক্তি ঠাকুর সম্পর্কে কটুক্তি করলে স্পষ্ট বক্তা মনোমোহন প্রহারের ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেন। একথা ঠাকুরের কানে গেলে তিনি মনোমোহনকে বলেন, "কেউ আমার নিন্দা করল কি সুখ্যাতি করল, তাতে আমার কি? আমি সকলের রেনুর রেনু।" এই কথায় মনোমোহন বেশ বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন। তখন ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "আমি কি তোমায় বকেছি যে তুমি চুপ করে মুখ গোঁজ করে বসে আছ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি? ক্রোধ না চণ্ডাল! শাস্ত্রে

কামের পরই ক্রোধকে শত্রু বলেছে। কাউকে রাগ করতে দেখলে আমি তাকে ছুঁতে পারি না।" এর ফলে মনোমোহনের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। এরপর কেউ তাঁর কথা না শুনলে বা বিপরীত তর্ক করলে তিনি তার সুবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতেন।

ধীরে ধীরে মনোমোহন ঠাকুরের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঘরে কন্যা মাণিকপ্রভা মুমূর্ষু জেনেও তিনি মায়ের উপদেশে শরণাগতির পরীক্ষা দিতে নিয়মমত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন, কিন্তু মায়ের নির্দেশ মত ঠাকুরের সাধনভূমি থেকে মাটি আনতে পারেন নি, পাছে সকাম ভক্তি প্রশ্রয় পায়। অন্তর্যামী ঠাকুর অবশ্য হৃদয়কে দিয়ে কিছু ধূলি ও ফুল তাঁর হাতে দেন এবং সে যাত্রা মাণিকপ্রভার প্রাণ রক্ষা পায়।

ঠাকুর মনোমোহনকে অনাসক্ত হয়ে সংসার করতে উপদেশ দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, জেনে রাখ, এ সংসার তোমার নয় – এ সংসার ভগবানের। মনোমোহন সে অনুসারেই জীবন যাপন করতেন।। অচিরেই তাঁকে অনাসক্তির কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মাসতুতো ভাই রামচন্দ্রের বাড়িতে মহোৎসবের সময় মা দেহত্যাগ করলেন, মনোমোহন শান্ত চিত্তে এ আঘাত সহ্য করলেন। প্রাণপ্রিয় কন্যা মাণিকপ্রভাও ইহলোক ত্যাগ করল। তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করে নির্লিপ্ত হয়ে রইলেন। দুটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় কলেরা রোগে প্রাণ হারাল। তথাপি তাঁর ধৈর্যহানি হল না, বরং তাঁর যেন মনে হল এ বিশ্ব সংসার যেন একটি খেলাঘর। শেষ পর্যন্ত পুরীধামে তাঁর স্ত্রী ও দেহত্যাগ করলে তাঁর মনে হল তিনি যেন সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধের দিনে তিনি শঙ্খ বাজিয়ে নৃত্য করেছিলেন। ঠাকুরের কৃপাতেই তিনি পর পর এতগুলি আঘাত সহ্য করতে পেরেছিলেন। একবারের জন্য কোন অভিযোগ তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়নি।

ঠাকুরও তাঁকে নানাভাবে নানারূপে দেখা দিয়ে তাঁর মনকে উচ্চ সুরে বেঁধে রেখেছিলেন। কাঁকুড়গাছির মন্দির-বেদীতে ঠাকুরের ছবির পিছনে তিনি

স্বয়ং ঠাকুরকে উঁকি মারতে দেখেছিলেন। এই দর্শনের পর তাঁর সমাধি হয়। পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে দেখেন জগন্নাথের জায়গায় স্বয়ং ঠাকুর বসে আছেন এবং মহানন্দে ধ্বনি দেন, "রামকৃষ্ণ রূপী জগন্নাথের জয়!" কাঁকুড়গাছির মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছিলেন ঠাকুর আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন এবং তাঁর মুখে মধুর স্নিগ্ধ হাসি। তিনি সবাইকে ডেকে সেই নয়ন মনোহর রূপ দেখতে বললেন। তিনি ভাবে এইরূপ দেখেছিলেন, অন্যরা কিভাবে দেখবে? বহু ভাগ্যে কোন ভক্ত ঠাকুরের এই নিত্যলীলা দর্শন করতে পারে। মনোমোহন সত্যই মহা ভাগ্যবান ভক্ত ছিলেন।

ভারতাত্মা শ্রীচৈতন্য **ডাঃ রুহিদাস সাহা**

মধ্য-যুগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষুব্ধ ভারতের পথ-প্রান্তর যখন ছিল কন্টকাকীর্ণ , জঙ্গলাকীর্ণ পথ-ভূমি যখন ছিল শ্বাপদ সঙ্কুল, আর যানবাহনের তেমন কোন ব্যবস্থাই ছিল না, ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য পদব্রজে ভারত-পরিভ্রমণ করেছেন। বিষয়টি বিস্ময়ের হলেও চৈতন্য জীবনের বিশেষত্বই এই যে, ভয় ভীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। রাজশক্তির প্রতিবন্ধকতা তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভয়ঙ্কর কায়েমী-স্বার্থবাদ আর নিপীড়িত মানুষের হীনমন্যতা এই ত্রিকোণ আক্রমনের মাঝেও সমুদ্র মন্থন করে তিনি যে অমৃতকে উপহার দিলেন সেই মানব ধর্ম প্রেম ধর্মকে ভারতময় ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়েই তাঁর ব্যাপক ভারত পরিক্রমা। উদার সাম্য, অতুলনীয় মমত্ববোধ ও অসাধারণ মানবপ্রেমের উপাদানেই ভারতে একটি মহৎ ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সমগ্র ভারতকে প্রেমের যোগসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন বলেই শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে দ্বারকার উপকূল এবং উত্তরে হরিয়ানা থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করেছেন। পরিব্রাজক

DO NOT COPY

শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমণ প্রকৃতপক্ষে এক মহান ভারতপ্রেমিকের পথ পরিক্রমা।

ভারত-পরিব্রাজকের প্রথম পরিক্রমা বর্ত্তমান বাংলাদেশে। তখন শ্রীচৈতন্যের বয়স প্রায় একুশ বছর, সুদর্শন সুপুরুষ সৌম্যকান্তি যুবক। উদীয়মান অধ্যাপকরূপে তখন তাঁর যশোরশ্মি মধ্যাহ্ন সূর্য-রশ্মির মতোই দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। সেই যশোরশ্মি নিয়ে তিনি প্রথম পর্য্যায়ে গিয়েছিলেন তদানীন্তন আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্টে পিতার জন্মভূমি দর্শন অভিলাষে। সেখান থেকে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত স্থানসমূহ সহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান সফর করে পিছনে তিনি যে খ্যাতি ও মহত্ব রেখে এসেছিলেন তাতেই সেই দেশের মানুষ পরবর্তীকালে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। অন্তরে তাঁকে ঈশ্বরত্বে এমনই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল যে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের বৎসরেই তাঁর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধরগণ শ্রীহট্টের দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেছিলেন।

বছর তেইশ যখন তাঁর বয়স তখন তিনি গিয়েছিলেন বিহারে, গয়াধামে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। গয়াধামের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁর জীবনে ভাবান্তর ঘটে। নবদ্বীপ থেকে যাত্রা করে ভাগলপুর জেলায় মন্দারে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে মধুসূদন মন্দির দর্শন করে গিয়েছিলেন পুনপুনে। পুনপুনে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সেরে তিনি গিয়েছিলেন রাজগীর। সেখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দান করে সেখান থেকে পৌঁছেছিলেন গয়ায়। গয়া থেকে মন্দার, কংসনদ ও বৈদ্যনাথ দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে ফিরে আসেন তিনি নবদ্বীপে ১৪৩০ শকাব্দের পৌষমাস শেষে। গয়াতেই ঈশ্বরপুরী দশাক্ষরী বীজমন্ত্র শ্রীচৈতন্যের কানে দিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বিহারের অধিবাসীদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরবৃন্দের মধ্যে জনৈক কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়েছিল বিহারের বাঁকীপুরে। পাটনা থেকে চার মাইল দূরে গাইঘাট নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যের একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে গয়ায় যে ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে ১৪৩১ শকাব্দের ২৬শে মাঘ বুধবার শেষ রাত্রিতে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ২৭ শে মাঘের কোন এক সময়ে তিনি পৌঁছান কাটোয়ায়। ২৮শে মাঘ শুক্রবার সন্ন্যাসের আয়োজন হয়। সেদিনই মধু নাপিত মস্তক মুন্ডন করলেন। শেষে ২৯ শে মাঘ সংক্রান্তি শনিবার ৪ দন্ডের মধ্যে পূর্ণিমা তিথিতে কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। ২৯শে কাটোয়াতে কাটিয়ে ১লা থেকে ৪ঠা ফাল্গুন পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ ভ্রমণ করে গঙ্গাতীরে পৌঁছে ৫ই ফাল্গুন সকালে তিনি নিত্যানন্দকে পাঠালেন নবদ্বীপে, আর নিজে গঙ্গাতীরে এক গ্রামে সাময়িকভাবে অবস্থান করে ফুলিয়ায় হরিদাসের বাসস্থানে অবস্থান করলেন দিন দুই। সেখান থেকে শান্তিপুরে পৌঁছুলেন ১০ই ফাল্গুন।

সন্ন্যাস শেষে শান্তিপুরে পৌঁছে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করে এবার যাত্রা করলেন তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে। শান্তিপুর থেকে গঙ্গাতীর পথে পানিহাটী–বরানগর–আঠিসারা–ছত্রভোগ–রেমুনা–যাজপুর–কটক–ভুবনেশ্বর–কমলপুর–আঠারনালা–কপোতেশ্বর হয়ে ফাল্গুনেই পৌঁছুলেন তিনি পুরীতে। পানিহাটীতে উঠেছিলেন রাঘব পণ্ডিতের ভবনে আর বরানগর মালীপাড়া গ্রামে পণ্ডিত রঘুনাথ উপাধ্যায়ের ভজন কুটীরে। সঙ্গী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত।

১৪৩২ শকাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাত্রা করে ১৪৩৩ শকাব্দের বর্ষা শেষে গোদাবরী তীরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৪৩৪ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রার পূর্বে পুরীতে ফিরে আসেন। পুরী থেকে আলালনাথ–কূর্ম্মস্থান–জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র হয়ে গোদাবরী নদীতীরে বিদ্যানগরে ১০ দিন অবস্থান করেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তা রায় রামানন্দের মিলন হয়। সেখান থেকে গৌতমী গঙ্গা–মল্লিকার্জুন তীর্থ–দাসরাম–মহাদেবস্থান–সিদ্ধিবট–স্কন্দক্ষেত্র–ত্রিমঠ–বৃদ্ধকাশী–ত্রিপদী–ত্রিমল্ল–বেঙ্কট অচল–বর্তমান কাঞ্চিপুরম–পানা নৃসিংহ–শিবকাঞ্চী–বর্তমান তিরুপতি–কাঞ্চীপুরম থেকে পাঁচ মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী–পঞ্চতীর্থ–পীতাম্বর শিবস্থান–শিয়ালী

ভৈরবী-দেবীস্থান-কাবেরী নদীতীর-বেদাবন-অমৃতলিঙ্গ শিবস্থান তাঞ্জোর নগরে অবস্থিত শিবক্ষেত্র-পাপনাশন হয়ে পৌঁছুলেন তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বর্তমান চেন্নাই রাজ্যের শ্রীরঙ্গম-এ। এখানে তিনি বেংকট ভট্টের অনুরোধে তাঁর গৃহে বর্ষার চার মাস অবস্থান করেছিলেন। এই বেংকট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্টই শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্তরূপে ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। কূর্মক্ষেত্র কূর্ম্মস্থান বর্তমান নাম শ্রীকূর্মম-এ শ্রীচৈতন্য কুষ্ঠরোগী বাসুদেবকে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র থেকে গেলেন ঋষভ পর্বতে, বর্তমান দক্ষিণ কর্ণাটকে মাদুরা জেলার পালনি হিল-এ। কামকোঠি বর্তমান তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্ হয়ে গেলেন দক্ষিণ মথুরা, মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত বর্তমান মাদুরাই। মহেন্দ্র শৈল বা বর্তমান পূর্বঘাট ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ হয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণ মথুরায় মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত বর্তমান মাদুরায়। সেখান থেকে পাণ্ড্য দেশে কন্যাকুমারীর পাশে প্রবাহিত তাম্রপর্ণী বর্তমান নাম তিনেভেলি হয়ে গেলেন তিনি তিলকাঞ্চী বর্তমান তেলকাশী। তারপর গেলেন ত্রিবান্দ্রমের তিনেভেলি থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পানাগড়ি তীর্থে। সেখান থেকে মলয় পর্বত, তারপর কন্যাকুমারী। সেখান থেকে শিংহারি মঠ বর্তমান নাম শৃঙ্গেরী মঠ হয়ে গেলেন মৎস্যতীর্থ বর্তমান মাহে নগর বা মস্‌লি বন্দরে। এছাড়া তিনি গিয়েছিলেন তুঙ্গভদ্রা দ্বৈপায়নী-সূর্পাবক তীর্থ বর্তমান 'খানা' জেলায় 'সাপারা' নামক স্থান-কোলাপুর-পাণ্ডুপুর বর্তমান শোলাপুর জেলার পন্টবপুর-সেতুবন্ধে ধনুতীর্থ-ঋষ্যজুনগিরি-দণ্ডকারণ্য-তুঙ্গভদ্রা তীরবর্তী সরোবর পম্পা সরোবর-নাসিক বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার সদর নাসিকনগর-পঞ্চবটী-বরোদানগর-সোমনাথ-জুনাগড়-গৃণারগিরি-ভদ্রানদীতীর-অমরাপুরী গোপীতলা যার নাম প্রভাসতীর্থ-দ্বারকা-গুজরাট-বরোদানগর-নর্মদাতীর-দোহদানগর-নর্মদার ধারে ধারে কুক্ষী নগর-আমঝোরা-বিন্ধ্যগিরীর উপর মন্থরানগর-মলয় পর্বত-রায়পুর-পুনরায় বিদ্যানগর (গোদাবরীতীর) হয়ে যে পথে গিয়েছিলেন সে পথেই আবার পুরীতে প্রত্যাবর্তন। এই যাত্রায় সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণদাস। কারও কারও মতে এই কৃষ্ণদাসই "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচয়িতা কৃষ্ণদাস গোস্বামী।

তারপর শ্রীরঙ্গম থেকে শ্রীচৈতন্যদেব নীলগিরি, কুম্ভকোণম, মাদুরা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পাণ্ড্যদেশ, মলয় পর্বত প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থ দর্শন করে ভারতের দক্ষিণতম সীমা কন্যাকুমারীতে এসে উপস্থিত হলেন। বনজঙ্গল, নদনদী, পর্বতমালা অতিক্রম করতে করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধর্মান্ধতার যে পাষাণপ্রাচীর এযাবৎ প্রেমভক্তির অমৃতসিন্ধুকে যুগ যুগ ধরে আলাদা করে রেখেছিল, শ্রীচৈতন্যের দেবদুর্লভ প্রেমবিগ্রহের পদার্পণে সেই পাষাণ বিগলিত হয়ে শুষ্ক ব্রহ্মবাদ ও নাস্তিক্যমতের প্রাচীর অদৃশ্য হয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রেমভক্তির প্লাবনে ভেসে এসে প্রেম-সিন্ধুতে ডুব দিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেনঃ

এরপর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৫ শকাব্দে রথের পর বিজয়াদশমীর দিন নীলাচল থেকে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বর্ষার পূর্বে তথা রথের পূর্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি প্রায় আট ন'মাস গৌড়দেশ ভ্রমণ করেন।

গৌড় ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য পুরী থেকে ভবানীপুর-ভুবনেশ্বর-কটক-চিত্রোৎপল নদী-চতুর্দ্দার-যাজপুর-রেমুনা-উড়িয়া কটক হয়ে মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদীর তীরবর্তী পিছলদার মধ্য দিয়ে জলপথে পানিহাটিতে এসে উঠেছিলেন রাঘব পন্ডিতের গৃহে। সেখান থেকে গেলেন তিনি কুমারহট্টে বর্ত্তমান হালিশহরে শ্রীবাসের গৃহে। তারপর কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের বাড়ী। শিবানন্দ সেনের বাড়ী থেকে কাঁচড়াপাড়াতেই বাসুদেব দত্তের গৃহে। সেখান থেকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হয়ে গেলেন ফুলিয়াতে। ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে। সেখান থেকে গেলেন গৌড়-রামকেলি কানাইয়ের নাটশালা। ফিরে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে। সঙ্গে ছিলেন পুরী গোসাঞি, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, ঠাকুর হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, দামোদর পণ্ডিতাদি বহু ভক্ত। শান্তিপুর থেকে ফিরে এসেছিলেন নীলাচলে।

গৌড় থেকে ফিরে সেই বছরই অর্থাৎ সন্ন্যাসের ৬ষ্ঠ বর্ষে শরৎকালে তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন। পুরী থেকে ঝাড়খণ্ডের পথে কাশী, প্রয়াগ বর্ত্তমান এলাহাবাদ, মথুরা গমন করেন। মথুরা থেকে দ্বাদশবন-আরিট গ্রাম বা অরিষ্টগ্রাম-রাধাকুন্ড-সুমন সরোবর অর্থাৎ গোবর্দ্ধনের কুসুম সরোবর-গোবর্দ্ধন পর্ব্বত-ব্রহ্মকুণ্ড-মানস গঙ্গা সরোবর-গাঁঠুলি গ্রাম-অন্নকুট গ্রাম বা আনিয়োর-কাম্যবন-মথুরা জেলার নন্দীশ্বর-পাবল সরোবর-খদিরবন-ব্রজমন্ডলে অবস্থিত শেষশায়ী-ব্রজমণ্ডলস্থ তীর্থ খেলাতীর্থ ব্রজমন্ডলস্থ দ্বাদশবনের অন্যতম বন ভাণ্ডীরবন-ভদ্রবন-শ্রীবন-লৌহবন-মহাবন-যমলার্জুন ভঙ্গাস্থান-গোকুল-মথুরানগর-অক্রুরতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ পরিক্রমা করে এলেন তিনি বৃন্দাবনে। কালীয়হ্রদ-প্রস্কন্দন-দ্বাদশ আদিত্য কেশীতীর্থ-রামস্থলী-চীরঘাট-নামে যমুনার একটি ঘাট, অক্রুর প্রভৃতি স্থান পরপর দর্শন করলেন। পুনরায় গেলেন মহাবনে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বৃক্ষতল, মথুরার নিকটবর্ত্তী গঙ্গারতীরে অবস্থিত একটি স্থান সোরাক্ষেত্র হয়ে এলেন প্রয়াগে। এখান থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটস্থ যমুনার অপর তীরে অবস্থিত তাঁর গ্রাম আড়েল-গ্রামে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এলেন বল্লভ ভট্ট। সেখান থেকে পুনরায় প্রয়াগে গিয়ে কাশীতে ফিরে এলেন তিনি। প্রায় দশ মাস পরিক্রমার পর ঝাড়খন্ডের পথে আঠারনালা হয়ে রথযাত্রার পরই পুরীতে ফিরে এলেন।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে শুধু পুরীতেই অবস্থান করেন নি। পদার্পণ করেছেন শ্রীরেমুনা, যাজপুর, ভুবনেশ্বর, কোনারক, সাক্ষিগোপাল, আলালনাথ ও গুণ্ডিচা মন্দির।

শ্রীচৈতন্য দেহ ধারণ করেছিলেন মাত্র আটচল্লিশ বছর। এর মধ্যে চব্বিশ বছর গাহর্স্থ্যজীবন, অবশিষ্ট চব্বিশ বছর সন্ন্যাস জীবন। শেষ আঠারো বছর তিনি পুরীতেই অবস্থান করেছিলেন। মধ্যবর্তী বছর ছয়েক অতিবাহিত হয়েছে দক্ষিণ ভারত, গৌড়, উত্তর ভারত পরিক্রমায়।

কয়েকখানি অসমীয়া সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্য আসামে গিয়েছিলেন। ভউদেব তাঁর 'সৎসম্প্রদায় কথা' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। নৃসিংহকৃত্য নামক একখানি গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কৃষ্ণ আচার্য্যের রচিত 'সন্তবংশাবলী' তে শ্রীচৈতন্যর আসাম ভ্রমণের কথা রয়েছে। কৃষ্ণ আচার্য্য বলেছেন, শ্রীচৈতন্য বরাহকুন্ডের উপর রত্নেশ্বরকে 'শরণ' দেন, কন্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠের উপদেশ দেন ও কন্ঠহার কন্দলিকে কৃপা করেন। তারপর কবিশেখর ব্রহ্মাকে নাম-ধর্ম দান করে সেখান থেকে উড়িষ্যায় গমন করেন। আসামে জনশ্রুতি রয়েছে যে, কামরুপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু এসেছিলেন। হাজোতে মণিকূট নামে একটি ছোট পাহাড় রয়েছে, সেই পাহাড়ের শিখর দেশে হয়গ্রীব মাধবের মন্দির বিদ্যমান রয়েছে, উহার পাদদেশে রয়েছে একটি গহ্বর এবং তার কাছেই বরাহকুন্ডের অবস্থান। এই গহ্বরটিকেই 'চৈতন্য ধোপা' বলা হয়ে থাকে এবং চৈতন্যদেব কিছুদিন এই গহ্বরে বাস করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বর্ষে গৌড় ভ্রমণে প্রায় আট মাস অতিবাহিত করেন। এতটা সময় কোথায় অতিবাহিত হয়েছিল তার কোন সঠিক হিসাব মেলে না। এছাড়া, বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে বারানসীতে দুমাস অর্থাৎ চৈত্রমাস পর্যন্ত থাকার পর কবে তিনি পুরীতে ফিরেছিলেন তা জানা যায় না। এই দুই সময়ের কোন এক সময়ে আসাম পরিক্রমায় গিয়েছিলেন।

পথ-প্রান্তর, বন-উপবনের মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের এই যে বিরাট পর্যটন তাঁর এই যে ব্যাপক ভারত পরিক্রমা তা কেবল একজন সাধকের পথ চলা নয়, এই পরিক্রমা এক অনন্য ভারত-প্রেমিকেরও, এক পরমপুরুষেরও। সেই কারণেই তো তিনি যেখানে গিয়েছেন, যে পথে চলেছেন সেখানেই তিনি রেখেছেন অসীম মানব প্রেমের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাই তো মানুষও এই পরমপুরুষের জন্য পাগল হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলা যায়- "লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।" কৃষ্ণদাস আরও বলেছেন-"মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা। কতলোক আসে যায় কে করে তালিকা।" এ চিত্র দক্ষিণ ভারতের। উত্তর ভারতেও তাঁর আগমনে এতই লোকারণ্য হয়েছিল যে, শ্রীচৈতন্য 'লোকের

সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া। একান্তে অক্রুর তীর্থে রহিলা আসিয়া।' এমন উদাহরণ অসংখ্য তাঁর চলার পথে সর্বত্র। এভাবেই তিনি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতপ্রায় ভারত বোধে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। শ্রীচৈতন্য ভারতীয় জাগৃতির অনন্য স্রষ্টা।

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বঙ্গদেশ হলেও কর্মভূমি ভারতব্যাপী। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশেই শুধু নব জাগরণ দেখা দেয়নি, তাঁর প্রচারিত মানব ধর্মের স্পর্শে সারা ভারতই সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়েছে, জেগে উঠেছে। বৃন্দাবন-নীলাচল তো তাঁর কর্মকান্ডের এক একটি প্রকাণ্ড পীঠস্থান। বৃন্দাবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন- "নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।" বৃন্দাবনে অবস্থানে মায়ের অনুমতি না থাকায় "লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ"-এর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন রূপ-সনাতন গোস্বামীর উপর। তাঁরাও শ্রীচৈতন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন-"তাঁহা (মথুরা-বৃন্দাবন) যাব সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ।" এই দেশ অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবনই তাঁদের দেশ, কারণ এই দেশই তাঁদের প্রাণের ঠাকুর হৃদয়-দেবতা শ্রীচৈতন্য দান করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য কাশীতে বসে সনাতনকে দু'মাস ধরে নানাবিধ তাত্বিক শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে বৃন্দাবন ও মথুরায় লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে হবে, বৃন্দাবনে সেবা-প্রচারাদি করবেন কি করে, ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারের ভিত্তিই বা হবে কি সে বিষয়ে দীর্ঘ বিস্তৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বৃন্দাবন গিয়ে সনাতন তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে দশাশ্বমেধে দশদিন পর্যন্ত শ্রীরূপের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন এবং নানা বিষয়ক তত্ব-শিক্ষা দিয়ে ভক্তি গ্রন্থ প্রণয়ন ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন পাঠিয়েছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীও সে আদেশ যোগ্যতার সঙ্গে সমাধা করেছিলেন।

চিঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ আর তৈমুরলঙের লুন্ঠনে তীর্থাদি শ্মশানে রূপান্তরিত হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল এক একটি ধ্বংসস্তুপ। ধর্মান্ধ সুলতানদের নিপীড়নেও তীর্থভূমিগুলি স্বস্তির স্বাদ পায়নি। তাছাড়া প্রথম পাণিপথ, খানুয়া ও

গোগ্‌বার যুদ্ধ বিগ্রহ আর বিদ্রোহে ভারতের অবস্থা তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এসব তো ঐতিহাসিক সত্য। এরূপ ভীতি ও সন্ত্রাসে পূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যের অভয়বাণী নিয়ে ভয়হীন ভক্তগণ একনিষ্ঠ সৈনিকের মত সুচারুরূপে আদেশ পালন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভয়-ভীতির স্থান ছিল না। ভয়-ভীতি ছিল না তাঁর ভক্তদের মধ্যেও। তাই সেদিন তাঁরা রাজধানী দিল্লীর পাশে বৃন্দাবন ও মথুরার ধ্বংসস্তূপের উপরে নতুন করে তীর্থ আবিষ্কার করেছিলেন, মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এত বড় কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁদের কম ক্লেশ ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সে সবে পরাজয় বরণ করার মত মানসিক দুর্বলতা তাঁদের ছিল না। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের প্রচেষ্টায় শাস্ত্রভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে বসেই রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট, প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃতই তখন সর্বভারতীয় ভাষা। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেম-ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশ্যেই সেই সর্বভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় ভক্তগণের দ্বারা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত সাহিত্য যেন নতুন প্রাণ স্পন্দনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গেল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হল। শ্রীচৈতন্য স্পর্শমণির পরশে রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রবোধানন্দের পাণ্ডিত্য যেন আর বাঁধ মানলো না। তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন এক এক জন শক্তিধর লেখকরূপে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে সনাতন গোস্বামী বিরচিত গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃহদ্ভাগবতামৃতম্, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষনী, হরিভক্তি বিলাস, দশম টিপ্পনী, দশম চরিত প্রভৃতি। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ হল উজ্জ্বল নীলমণি, দানকেলি কৌমুদী ভাণিকা, পদ্যাবলী, বিদগ্ধমাধব নাটকম্, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, লঘুভাগবতম্, ললিত মাধব নাটকম্, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, মথুরা মাহাত্ম্য, উদ্ধব সন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি বিধি, পদ্যাবলী আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকাচন্দ্রকাদি। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো-হরিনামামৃত ব্যকরণ, সূত্র মালিকা, ধাতু

সংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা, গোপাল বিরুদাবলী, রসামৃত শেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব। কবি কর্ণপুর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পুঃ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্, চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্। প্রবোধানন্দ লিখেছিলেন চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও নবদ্বীপ শতকম্। মুরারি গুপ্তের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতম্। এতো শুধু ভক্তদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র। প্রাচীন গ্রন্থাদির উপরেও তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অসীম। এক হরিভক্তি বিলাসেই একশ আঠারোখানি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সে কারণেই বৃন্দাবনে গড়ে উঠেছিল বিরাট গ্রন্থাগার, সংগৃহীত হয়েছিল অসংখ্য গ্রন্থ। এই দুরূহ কর্মকাণ্ড কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণাতেই। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহে শ্রীচৈতন্যদেবের আগ্রহ ছিল অসামান্য। আদি কেশবের মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি দেখে উহার প্রতিলিপি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কৃষ্ণ-কথামৃত পুঁথির প্রচার দেখে উহার নকলও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর ভক্তগণ তাঁদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মাধ্যমে সারা ভারতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করে অসীম আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য লীলার অপর তীর্থভূমি উড়িষ্যা-নীলাচল-পুরী। শ্রীচৈতন্য জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীতেই কাটিয়েছেন। ফলে পুরীর প্রতিটি ধূলিকণা শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে হয়ে উঠেছে পরম পবিত্র। পুরীর মন্দিরাদি হয়েছে শ্রীচৈতন্য-স্মৃতি বিজড়িত। তাই তো জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্য নাম গৌর-বাটি। রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ সহ উড়িষ্যাবাসী সকলের দৃষ্টিতেই তো শ্রীচৈতন্য সচল জগন্নাথ। এই সচল জগন্নাথ জাগিয়ে তুলেছেন বঞ্চিত জনসমাজকে, অধিকারে উদ্দীপ্ত করেছেন সকলকে। শ্রীচৈতন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাণ, নিয়মিত করেন তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদ-প্রক্ষালন। শ্রীচৈতন্যকে না দেখে তাঁর প্রাণ বাঁচে না। শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণে যাবার সময় তাই তো তিনি সাশ্রু নয়নে উড়িষ্যা-সীমান্তে এসে বিদায় দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যকে। শ্রীচৈতন্যের অনুপস্থিতিতে পুরী অন্ধকার। আবার তাঁর প্রত্যাগমনে পুরী আলোয়-আলোময়। এই আলোর আকর্ষণে প্রতি বছর রথযাত্রায় বঙ্গদেশ থেকে ভক্তগণ

দলে দলে পুরীতে এসেছেন, প্রথমে তাঁরা তাঁদের প্রাণের ঠাকুর সচল জগন্নাথ দর্শন করেছেন। তারপর দর্শন করেছেন অচল জগন্নাথকে।

সেক্সপীয়ারের সনেট* **অনুবাদ-শ্রী সরোজকুমার দত্ত**

চার দশকের শীতের ছায়া পড়বে যখন তোমার ললাট পরে,
রূপের বিথারে যখন উঠবে জেগে বলিরেখার ঢেউ
কেবল সুষমা বলে যারে তুমি রেখেছ বুকে ধরে
ছিন্ন তৃণের বেশি সেদিন তাকে দাম দেবে না কেউ।
তখন যদি শুধায় তোমায় কেউ, কোথায় সে রূপ আজ,
কোথায় গেল সেই যে তোমার রঙিন দিনগুলি,
কোটরগত ঐ চোখে সেদিন দেখেই পাবে লাজ
আছে সেথায় পড়ে কেবল নানান শূন্য কথার ঝুলি।
মূল্য হত ঐ রূপেরই কত যদি তুমি পারতে বলে দিতে
"দেখ আমার ফুটফুটে ঐ শিশুর দিকে চেয়ে
জীবন বেলার যত কৈফিয়ৎ সবই আমি দিয়েছি ওর হাতে।"
শেষ জীবনে রক্ত যখন সর্বদেহে শীতল হয়ে আসে
হারানো সেই সজীবতা মানুষের ঐ শিশুর দেহেই ভাসে।।

****

"When Forty Winters Shall Besiege Thy Brow ....."
By William Shakespeare

DO NOT COPY

বেঁচে থাকার কবিতা

সুনন্দন ঘোষ

ফাল্গুনের ভোর।
কোনো গাছে পাতা ঝরার দিন,
কোনো গাছে কিশলয়।
ইস্ত্রীওয়ালার উনুন থেকে সাদা ধোঁয়া
মিলিয়ে যায় কুয়াশার আলিঙ্গনে।
রোজ দেখি আর ভাবি
এই নরম আলো, মিষ্টি কুয়াশা, কচি সবুজ পাতা --
এবার একটা প্রেমের কবিতা আসুক আমার লেখায়।

এলোই না সে কবিতা!
এলো অচেনা এক বিদেশিনীর মুখ -
স্নেহের আগলে জড়িয়ে রেখেছে এক ফুটফুটে বাচ্চাকে,
যার বাবা মা ঘুমিয়ে রয়েছে তুরস্কের ধ্বংসস্তূপে।

এলো আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটার মুখ,
বরের মদ খাওয়ার টাকা চুরি করে
মেয়ের স্কুলের ড্রেস কিনে দিয়েছে এই মাসে।

এলো হাস্যময় সহকর্মীর মুখ-
ক্যান্সারে স্ত্রীকে হারিয়েও
মায়ায় ভরিয়ে রেখেছে পথশিশুদের।

এরাই কবিতা এখন,
আমার বেঁচে থাকার কবিতা।

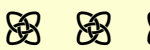

DO NOT COPY